সংবাদ

তারিখ ... 1-8-JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উপ-সম্পাদকীয়

অনির্বাণ বাতিঘর

মি না র মনসুর

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা হোক

'আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি। আমাদের জিম্মি করে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় বেতন বৃদ্ধির খবর।' এই আর্তনাদ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর অভিভাবকদের। এমনিতেই সারা বছর তারা আতঙ্কে থাকেন। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সেই আতঙ্ক চরমে পৌঁছে। হারাম হয়ে যায় রাতের ঘুম। অভিভাবকরা জানান, গত বছর স্কলাস্টিকা স্কুলে ভর্তি ফি ছিল ৫০ হাজার টাকা। এবার তা বৃদ্ধি করে ৬৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষ টাকা ডোনেশনের মাধ্যমে এ স্কুলে ভর্তি করা হয়। গত বছরের চেয়ে প্রতি শ্রেণীতে বেতন বাড়ানো হয়েছে ৬শ' টাকা। গত বছর প্রতিশ্রেণীর জন্য পুনঃভর্তি ফি ছিল ১২ হাজার টাকা। এবার তা ৩ হাজার বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ১৫ হাজার টাকা (ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০০৭)।

অভিভাবকদের এই জিম্মিদশা শুধু স্কলাসটিকা স্কুলেই নয়, এটাই হলো রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর একটি সাধারণ চিত্র। ভুক্তভোগীরা বলেন, বাংলাদেশের ভেতরে এ যেন আরেকটি বাংলাদেশ! এখানে কোন নিয়মকানুন নেই। তবে 'কোন নিয়মকানুন নেই' কথাটির সঙ্গে অনেক অভিভাবক আবার একমত নন। তাদের বক্তব্য হলো, নিয়মকানুন অবশ্যই আছে। সেটি হলো স্বেচ্ছাচারিতার। স্কুলের হর্তাকর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে শেষকথা। তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। যখন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা বাড়িয়ে দিতে পারে বেতন বা ভর্তি ফি। কারও কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না। বাচ্চাদের একটি স্কুলে ৫০ হাজার টাকা ভর্তি ফি কী ভাবা যায়? তারপর আবার এক লাফে ১৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি! ছাত্রপ্রতি ন্যূনতম ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন আদায় করা হচ্ছে প্রতি মাসে। সেটাই আবার বাড়ানো হচ্ছে বছর বছর। এক লাফে ৫শ' থেকে ৬শ' টাকা। কোন কোন স্কুলে পুনঃভর্তি ফিও এক লাফে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ৩ হাজার টাকা। কেন বাড়ানো হলো তার কোন উত্তর নেই। কিন্তু প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বেতন, ভর্তি ফি ও পুনঃভর্তি ফি।

অথচ বেশিরভাগ স্কুলের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। সস্তায় আবাসিক বাড়ি ভাড়া নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে স্কুলগুলো চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ স্কুলেই ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ব্যবস্থা বা পরিসর কোনটাই নেই। খেলার মাঠ দূরে থাক, গাদাগাদি করে দাঁড়ানোর মতো খোলা জায়গাও নেই বহু স্কুলে। নেই স্কুলগুলোর সামনে নিরাপদে গাড়ি থেকে উঠানামার মতো খোলা জায়গা। শ্রেণীকক্ষগুলো কবুতরের খোপের মতো। বসার বেঞ্চগুলোর অবস্থা আরও করুণ। সেখানে বসে শিক্ষার্থী শিশুকিশোররা হাঁসফাঁস করে গরমের কিংবা বৃষ্টির দম বন্ধ করা দিনগুলোতে। এসি দূরে থাক জেনারেটর পর্যন্ত নেই বহু স্কুলে। নেই পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা। টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী। একটি টয়লেট ব্যবহার করতে হয় ৫০ থেকে ১শ' জন শিক্ষার্থীকে। এ কারণে অনেকে টয়লেট ব্যবহার করতে চায় না। ফলে ইউরিন ইনফেকশনের শিকার হচ্ছে বহু শিক্ষার্থী। আর টয়লেট ব্যবহারকারীরা আক্রান্ত হচ্ছে, উপর্যুপরি কৃমি সংক্রমণসহ নানা ধরনের চর্মরোগে।

তোতাপাখির মতো কতগুলো পুঁথি মুখস্থ করানোর নাম যে শিক্ষা নয় সেটা আমরা সবাই জানি। বলিও। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই বললেই চলে। শরীর গঠনের জন্য নিয়মিত খেলাধুলার পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং মনসগঠনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজনও অপ্রতুল। বহুস্কুলে লেখাপড়ার মান নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে রয়েছে চরম অসন্তোষ। এত অর্থ ব্যয় করার পরও ক্লাস সেভেন-এইটে বাড়তি খরচ করে প্রাইভেট টিউটর দিয়ে সন্তানদের কেন পড়াতে হবে এই অভিযোগ ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের। শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির কারণ হিসেবে একটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে সংবাদপত্রে। সেখানে ধানমণ্ডির একটি নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু মানসম্মত শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষকই যোগ্য ও মানসম্মত নন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা 'এ' লেভেলের ছাত্রদের কম বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা (ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০০৭)।

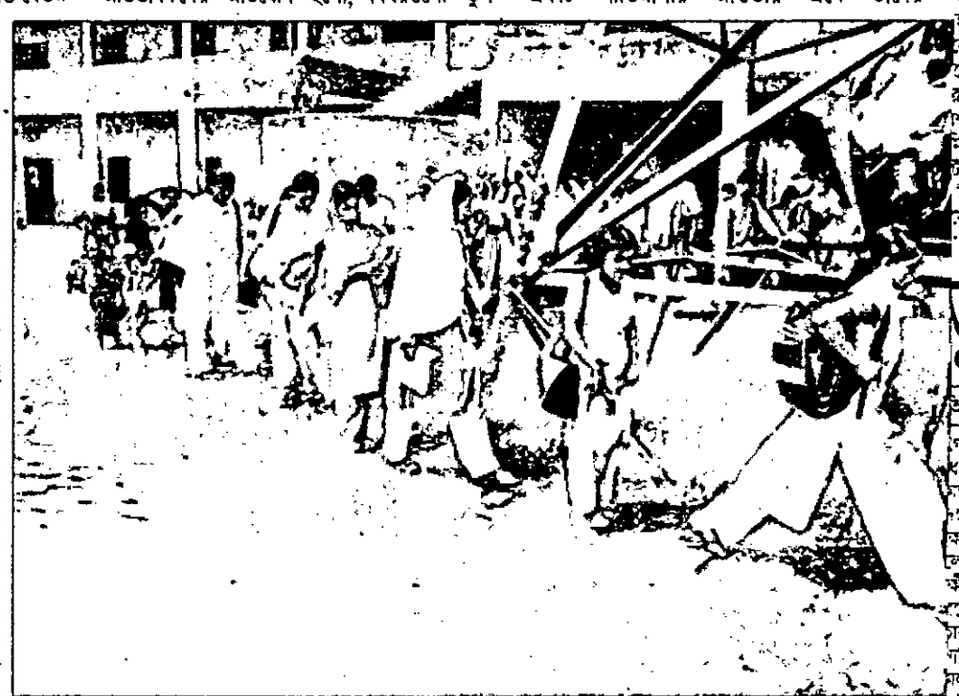

অভিভাবকদের অভিযোগ হলো, বিষয়গুলো স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। সচরাচর যারা এসব অভিযোগ শোনেন সেসব শিক্ষকের ক্ষমতা নেই কিছু করার। ক্ষমতা যাদের আছে তাদের নাগাল পাওয়া কঠিন। এসব নিয়ে অভিভাবকদের ক্ষোভের অন্ত নেই। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে স্কলাস্টিকাসহ বিভিন্ন স্কুলে। মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হয়নি। কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না কেউ জানে না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোকে একটি নিয়মের মধ্যে আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। নিবন্ধনের জন্য একটি সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হয়েছিল তাদের। এসব স্কুলে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থার কথা স্বীকার করে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরুরিভিত্তিতে একটি অভিন্ন নীতিমালার মধ্যে নিয়ে আসা হবে। সেই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগও নিয়েছিল সরকার। সরকারের এসব বক্তব্য ও উদ্যোগ ভুক্তভোগী জনগণকে আশ্বস্তও করেছিল।

সরকারের সেই উদ্যোগ ইতোমধ্যে পথভ্রষ্ট কিংবা আঁতুড়ঘরেই অকালপ্রাপ্ত হয়েছে কি না আমরা জানি না। এ নিয়ে আর কোন সাড়াশব্দ শোনা না যাওয়ায় ভুক্তভোগীদের উদ্বেগ শুধু নয়, রক্তচাপও বাড়তে শুরু করেছে। বাড়ার অন্যতম কারণ হলো, স্কুলগুলোকে একটি নীতিমালার আওতায় এনে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোন খবর নেই, অথচ চলতি অর্থবছর থেকে অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ভ্যাটের খড়্গ। যেন বোঝার উপর শাকের আঁটি! স্কুলের তরফ থেকে সেই নোটিশও চলে গেছে অভিভাবকদের হাতে হাতে। বাণিজ্যিকভাবে স্কুল-ব্যবসা করে যারা বিস্তর টাকা মুনাফা করছে তাদের ওপর অযৌক্তিক চাপানো হলে তার একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হিমশিম খাওয়া অভিভাবকদের ওপর ভ্যাট চাপিয়ে দেয়ার পেছনে সরকারের কী মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে তা বোঝা কঠিন।

তারপরও সরকারের উদ্যোগটিকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। কারণ তখনই দেশের মানুষ প্রথম জানতে পেরেছিল যে নামিদামি বহু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সরকারি নিবন্ধন পর্যন্ত নেই। সেটা জেনে অনেকে